Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তা-জগৎ

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.2
Pages	26-45
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তা-জগৎ

সৌমিত্র শেখর*

কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) দীর্ঘ কর্মময় জীবন আলোচনা করলে তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে অনেকগুলো। একাধারে তিনি বিজ্ঞানী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ ও সংগঠক। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এসব পরিচয়কে ছাপিয়ে তিনি আজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন 'মুক্তচিন্তার পথিকৃৎ' হিসেবে।

যেসব ক্ষেত্রে কাজী মোতাহার হোসেনের সংশ্লিষ্টতা ছিলো, তার প্রতিটি বিষয়েই তিনি ভেবেছেন নিজের মতো করে। ফলে এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে স্বীয় চিন্তার একান্ত পরিমণ্ডল। তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তা তো একটি পৃথক গবেষণার বিষয়।[১] এছাড়া তাঁর

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
[কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ২১ সেপ্টেম্বর '৯৭ তারিখের সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়] ।

১. কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বিজ্ঞান-মনস্কতা তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে ছোট কাল থেকেই। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ডব্লু. এ. জেনকিন্স, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের সাহচর্য তাঁকে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভে অনুপ্রাণিত করে। কাজী মোতাহার হোসেনই সর্বপ্রথম বিশেষ বিশেষ শর্ত পালন করে পরীক্ষণ-প্রকল্প বা Design of Experiment-এর একটা পরিচ্ছেদ উন্মোচন করেন। পিএইচ. ডি. গবেষণার অভিসন্দর্ভে তিনি তাঁর এই পদ্ধতি তুলে ধরেন। এই পদ্ধতিই এখন Hussain's Chain Rule নামে স্বীকৃত। মোতাহার হোসেন তাঁর আবিষ্কৃত এই শৃঙ্খলা সম্পর্কে লিখেছেন :

"এই নিয়ম ব্যবহার করে পরামাণ-সম্পন্ন একাধিক 'Symmetrical Balanced Incomplete Block Design' পাওয়া গেলে সেগুলো মূলত একই সমাধান, না শুধু নাম বদল করে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে— তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। সেগুলো মূলত একই সমাধান হলে সেই সমাধানগুলোকে Isomorphic বলা হয়।" (কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০)

তাঁর এই বিজ্ঞান-চিন্তা তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে '*নির্বাচিত প্রবন্ধের* ভূমিকায় তাঁর মন্তব্য :

"বিজ্ঞান যে সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা সমাজ ও

সঙ্গীত-চিন্তা নিয়েও ভিন্ন আলোচনা হতে পারে।[২] বর্তমান আলোচনায় কাজী মোতাহার হোসেনের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও শিক্ষা-চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর বিশাল চিন্তা-জগতের কিছুটা পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের দপ্তরে রক্ষিত কাজী মোতাহার হোসেনের চাকুরির 'ব্যক্তিগত নথি'তে দেখতে পাই, পদার্থ ও পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে তিনি দেশ-বিদেশের নানা সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন। সাহিত্য বিষয়ক নানা ফোরামের সঙ্গেও তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো। উক্ত নথিতে প্রাপ্ত দরখাস্ত অনুসারে তিনি ইস্ট-বেঙ্গল সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের গণিত ও বাংলা বিষয়ক কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান বাংলা সাহিত্য সংসদ এবং মাসিক 'দিলরুবা' পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সে-সব ফোরামের কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ১৯.৩.১৯৫১ তারিখে অনুমতি চেয়েছিলেন।[৩] নিবন্ধক ১১.৪.১৯৫১ তারিখে তাঁকে চিঠিতে জানান যে, কর্তৃপক্ষ এডুকেশন বোর্ড ও সাহিত্য সংসদের সদস্য হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু *'দিলরুবা'* পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে কাজ করার অনুমতি দেন নি। শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-মেলাতে আমন্ত্রিত হয়ে

জাতির মঙ্গল সাধনে শুভ-ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেটা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য।" (কাজী মোতাহার হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা)

বিজ্ঞানকে সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত করার দিক থেকে কাজী মোতাহার হোসেনের নাম জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায় কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে উচ্চারণ করা চলে।

২ একাধিক প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন সঙ্গীতের আন্তর-কাঠামো নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গীত-চিন্তা বিষয়ক বক্তব্য পাওয়া যায়। তাঁর সুযোগ্য কন্যা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন উল্লেখ করেছেন যে, লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজী মোতাহার হোসেন তাঁদের সঙ্গীতচর্চাকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। শুধু তা-ই নয়, সঙ্গীত সাধনায় কোথাও ব্যত্যয় বা বিকৃতি লক্ষ্য করলে সে বিষয়েও তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। (দ্রষ্টব্য : পিতা কাজী মোতাহার হোসেন, *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ জুলাই ১৯৯৭, ঢাকা)

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের দপ্তরে রক্ষিত পরিসংখ্যান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ব্যক্তিগত নথি ; পৃষ্ঠা নং-৩৫৫ ; কাজী মোতাহার হোসেনের ১৯.৩.১৯৫১ তারিখে লিখিত দরখাস্ত।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ বছরের (১৯৪৭-'৫৩) প্রবন্ধ সাহিত্যের উপর বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এইসব চিন্তামূলক বক্তব্য বা প্রবন্ধ এখনো সাধারণের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মাধ্যমে কাজী মোতাহার হোসেনের অবদানের ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেও নতুন কোন তথ্য সংযোজিত হতে পারে। বিশ্বভারতী আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চেয়ে মোতাহার হোসেন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি দরখাস্ত করলে কর্তৃপক্ষ পূর্ণ-বেতনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ থেকে এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করেন। কাজী মোতাহার হোসেনের দরখাস্ত থেকে জানা যায় যে, ওই সময় হাবীবুল্লাহ বাহার, কবি জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মাহবুবুল আলম প্রমুখ ব্যক্তিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।[৪] এ ধরনের আমন্ত্রণ লাভ কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি লাভেরই প্রমাণ।

ক.

যে সমাজ-পরিবেশে কাজী মোতাহার হোসেন অবস্থান করেছেন, সেখানে মুক্তি সুদূর পরাহত বলে মনে করা হতো। কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে বুদ্ধি ছিলো আড়ষ্ট হয়ে। এ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী কয়েক জন যুবক ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সংগঠন। কাজী মোতাহার হোসেন এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে লিখেছেন :

---

৪. প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা নং – ৪১০ ; নিবন্ধককে ৭.২.১৯৫৩ তারিখে কাজী মোতাহার হোসেন ছুটির দরখাস্তে লিখেছিলেন :

"... I have been invited by the authorities of Santiniketan, Bolepur, to attend a literary Conference (Sahitya-Mela which will take place on the 27th 28th Feb. and 1st March 1953) and to give an address on the progress of 'Dissertation Literature' (Prabandha Sahitya) in East Bengal during the past five years. I understand, Hon'ble Mr. Habibullah Bahar, Poet Jasim Uddin, M. Mansuruddin, Mr. Mahbubal Alam and some others have also been invited."

> বুদ্ধির মুক্তি' ছিল এই সমাজের মূলমন্ত্র। এই সময় একটা আল মামুন সমিতিও প্রতিষ্ঠা হয়। এই সব সমাজ বা সমিতির মিটিং–এ মুসলিম সমাজের বহু চিন্তার বিরুদ্ধে গরম গরম প্রবন্ধ পাঠ করা হত। [৫]

'সাহিত্য–সমাজে'র প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৫১) গ্রন্থের ভূমিকায়।[৬] মোতাহার হোসেন যে উল্লেখ করেছেন, 'মুসলিম সমাজের বহু চিন্তার বিরুদ্ধে গরম গরম প্রবন্ধ পাঠ করা হত' 'সাহিত্য–সমাজে'র অধিবেশনে, কাজী আবদুল ওদুদ তাকেই বুঝিয়েছেন 'অন্ধ–সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য' থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বলে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ডিরোজিও–র নেতৃত্বে গঠিত 'ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি'র কথা। কিন্তু তারপরও বলতে হয়, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সঙ্গে 'সাহিত্য–সমাজে'র কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিলো। কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুক্তির লক্ষ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল' গঠিত হয় নি, কিন্তু 'সাহিত্য–সমাজ' মূলত পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞান–মনস্কতা ও যুক্তিবাদ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত। তবে এ সংগঠন দুটোর চেতনাগত একটা ঐক্য তো ছিলোই। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন যে,'সাহিত্য–সমাজ' গঠনের প্রেরণার উৎস ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল।[৭] 'সাহিত্য–সমাজে'র তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতেও প্রতিষ্ঠানটিকে 'কার্য্যত: ইহা সাম্প্রদায়িক নহে' বলে ঘোষণা দেয়া হয়।[৮] এর সঙ্গে ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অমুসলমান ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতাও ছিলো। তদুপরি একথা মনে হয় যে, ভারতভূমিকে 'দারুল হর্‌ব' বা শত্রুর দেশ ঘোষণা করে যে ইসলামি চিন্তাবিদরা এক

---

৫. আবদুল হক (সম্পাদক), *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৪

৬. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ১৯৮৩, ব্র্যাক প্রকাশনী, ঢাকা, 'নিবেদন' অংশ : 'বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার–বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান— বাংলার মুসলমান–সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।'

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, ১৯৯২, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ১০৩

সময় জেহাদের[৯] ডাক দিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের শেষার্ধে নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে 'মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩) বা বিচারপতি আমির আলীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৮) যে ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, বিশ শতকের প্রথম পাদে তারই উত্তরসূরি হিসেবে ঢাকায় গড়ে ওঠে 'সাহিত্য-সমাজ'। অবশ্য চিন্তাবিদদের অনেকেই 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ যে-সব সামাজিক ও অর্থনীতিক কারণে বাঙালী মুসলমানকে বিশেষ প্রভাবিত করলো না, দেশের কোনো নেতাই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আপামর-সাধারণ সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি করতে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু-জাগরণ ও মুসলিম-জাগরণ চললো অনেকাংশে দুই আলাদা খাতে, তার নিরপেক্ষ ও সহৃদয়তাপূর্ণ ইতিবৃত্ত সংকলিত হওয়া আবশ্যক'[১০] মনে করলেও আজ অবধি এককভাবে কেউ তা সুচারু-সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

'সাহিত্য-সমাজে'র নামের সঙ্গে পরবর্তীকালে 'মুসলিম' ও 'ঢাকা' শব্দ দুটো সংযুক্ত হয়। আবুল ফজল লিখেছেন,[১১] বিশেষণ দুটোর বিশেষ কোন সার্থকতা ছিলো না। কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন[১২] যে, মৌলবাদী সমাজপতিদের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে, তারা যেন এর কর্মকাণ্ডকে পৌত্তলিকতা কিংবা নাসারা, নাস্তিক, ইহুদির কর্মকাণ্ড না ভাবেন সেজন্যে আবুল হুসেন প্রতিষ্ঠানটির নামের আগে 'মুসলিম' শব্দটি জুড়ে দেন। এই কৌশল ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কাছে গোপন থাকে নি, আর সে কারণেই হয়তো তারা কাজী মোতাহার হোসেনের দাড়ির মধ্যেও কুফরির গন্ধ আবিষ্কার করেছিলো।[১৩] প্রকৃতপক্ষে, 'সাহিত্য-সমাজে'র সংগঠকদের সংগ্রাম যে ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলো না, ছিলো ধর্মের নামে মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে, সে কথা তাঁরা বারবার বলেছেন। 'নির্বাচিত প্রবন্ধে'র (প্রথম

---

৯. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ. ৫৮

১০. আবদুল কাদির, *কাজী আবদুল ওদুদ*, ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; পৃ. ৬৩

১১. আবুল ফজল, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা*, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৪২

১২. অবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৩. আবদুল হক (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৩

খণ্ড) ভূমিকায় 'সাহিত্য-সমাজে'র কার্য-বিবরণীর উদ্ধৃতি দিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন :

> আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না- আমরা চাই বর্তমান মুসলমান সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না। আমরা চাই কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যৎকে মহিমান্বিত করিতে। আমরা জীবনকে 'ভোজের বাজী' মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না- আমরা চাই জগতের সমস্ত জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্যবান হইয়া জীবনের পদ্ধতি মার্জিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে।[১৪]

লক্ষ করার বিষয়, উপরি-উক্ত বক্তব্যটিতে আছে আধুনিক যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান-মনস্কতা আর প্রচণ্ড রকমের ইহজাগতিক আকর্ষণ-যার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মবোধের বিরোধ অপরিহার্য। গোলাম মোস্তফা ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কাজী মোতাহার হোসেনকে 'সাহিত্য-সমাজে'র 'হৃদয়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৫] 'আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা' প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন নিজেও লিখেছেন যে, সংগঠনটির পেছনে কর্মশক্তি ছিলো আবুল হুসেনের, চিন্তাশক্তি ছিলো আবদুল ওদুদের, নৈতিক সমর্থন ছিলো নবযুগের, আর হৃদয়শক্তি ছিলো তাঁর নিজের।[১৬] এ থেকে 'সাহিত্য-সমাজে'র সংস্কার ও যুক্তিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা অনুধাবন করা যায়। কুসংস্কারের আঁধার কেটে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে সামনে এগিয়ে এসে সমাজকে মুক্ত করার অসীম প্রেরণা নিয়ে মোতাহার হোসেন অগ্রবর্তী হয়েছিলেন 'সাহিত্য-সমাজে'র বার্ষিক মুখপাত্র 'শিখা' পত্রিকা সম্পাদনা করতে। ১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে- এই দু'বছর তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'— এই বক্তব্য শিরমন্ত্র বা 'মটো' হিসেবে মুদ্রিত হতো পত্রিকায়। ঐ সাময়িকীতে অগ্নিশিখার ছবি প্রকাশকে কেন্দ্র করে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে। পরে বাধ্য হয়েই ওই ছবির অর্থ ও

---

১৪. কাজী মোতাহার হোসেন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. [৫]

১৫. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪১২-১৩

১৬. আবদুল হক (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-৫

প্রকৃতির ব্যাখ্যা 'শিখা'তে ছাপতে হয়েছিলো।[১৭] কিন্তু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও পত্রিকার নাম পরিবর্তনের কথা ভাবেন নি। এই পত্রিকার নামানুসারে পরবর্তীকালে নিজেরা 'শিখা গোষ্ঠী' হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। সাধারণ হিসেবে বলা যায়, — ব্রিটিশ আমলের শেষ পঁচিশ বছর এবং পাকিস্তানি আমলের প্রায় পঁচিশ বছর মোটামুটি এই পঞ্চাশ বছর কাজী মোতাহার হোসেনের কর্মময় জীবন। স্বাধীন বাংলাদেশে যে এক দশক তিনি বেঁচে ছিলেন, ধীরে ধীরে বয়সের চৌহদ্দিতে আর দশটি মানুষের মতোই আটকে যান তিনি, তাঁর কর্মেও এসেছিলো স্থবিরতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তখনও তাঁর চিন্তাশক্তি ছিলো যথেষ্ট শাণিত। '*সাহিত্য-সমাজ*' প্রতিষ্ঠার অর্ধ শতাব্দী পর (১৯৭৬) নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> যে-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এক গোঁড়া, শাস্ত্রাচারে আবদ্ধ, প্রগতি-বিমুখ সমাজের সঙ্গে লড়েছিলাম তা যে অনেকখানি সার্থক হয়েছে— আজকের প্রগতিশীল বাংলাদেশের সমাজ দেখে তা বলা যায়।[১৮]

উদ্ধৃতিতে 'অনেকখানি' শব্দটির ব্যবহার কাজী মোতাহার হোসেনের উনআশি বছর বয়সেও সযত্ন-সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

খ .

'সাহিত্য-সমাজে'র সমষ্টিগত চিন্তার বাইরেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজী মোতাহার হোসেনের বড় বেশি ভাবনা ছিলো সমাজ নিয়ে। তিনি যেহেতু তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ নিয়েই ভেবেছেন অধিক, তাই তাঁর সমাজ-ভাবনার সঙ্গে ইসলাম ধর্মচিন্তাও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। 'শিখা গোষ্ঠী'র আর একজন প্রধান লেখক কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তাধারার ঐক্য লক্ষ করে সনজীদা খাতুন লিখেছেন :

> কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধাবলীর একটি মোটামুটি বড় অংশ যেমন মুসলিম সমাজের ধর্মকর্ম শিক্ষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ব্যয়িত হয়েছে, কাজী মোতাহার হোসেনেরও তাই। উভয়ের এই মিল, বস্তুত:, এঁদের শিখা গোষ্ঠী সাহচর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৯]

---

১৭. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

১৮. কাজী মোতাহার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. [৬]

১৯. সনজীদা খাতুন, আধুনিক চিন্তার সঞ্চরণ, *বইয়ের খবর*, এপ্রিল-জুন ১৯৮২, কাজী

কাজী মোতাহার হোসেনের সমাজ-চিন্তা প্রথম প্রকৃষ্টভাবে ফুটে ওঠে তাঁর 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' প্রবন্ধে। 'সাহিত্য-সমাজে'র অধিবেশনে পঠিত এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, আনন্দই জীবনের লক্ষণ। আনন্দ, স্ফূর্তি আর সুখ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ মুসলমানরা আনন্দ পেতে জানে না। কারণ আনন্দ প্রাপ্তির যে মাধ্যমগুলো তা থেকে এরা বহুদূরে অবস্থান করে। শাস্ত্রকে ভয় আর বিজ্ঞান শিক্ষাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এরা ইহজাগতিক সব কিছু বিসর্জন দেয় অনায়াসে। তিনি দুঃখ করে লিখেন :

> মুসলমান ত বেঁচে থাকতে আনন্দ করে না, সে মরে গিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে পেট ভরে খাবে, আর হুরপরীদের নিয়ে অনন্তকাল ধরে আনন্দ করবে। বাস্! তার সান্ত্বনা![২০]

আনন্দ-উৎস থেকে মুসলমানদের স্বেচ্ছায় দূরে থাকার প্রবণতা কাজী মোতাহার হোসেনকে আহত করেছে। তিনি মনে করেন, মুসলিমদের দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের মূলে তাদের কিছু গৎবাঁধা পদ্ধতিতে জীবনযাপন করা। তাঁর বক্তব্য :

> মুসলমানের যে গৃহ নেই, তার একটা কারণ আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোন সংশ্রবেই থাকবে না। মসুলমান পুরুষেরা কেবল কাজ করবে, আর ঘর শাসন করবে ; মেয়েরা কেবল রাঁধবে-বাড়বে, আর বসে বসে স্বামীর পা টিপে দিবে।[২১]

এ থেকে তিনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিচারে মুসলমানদের এ পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হচ্ছে, তাদের শিক্ষার অভাব ; শুধু শিক্ষাই নয়, সুশিক্ষা। সুশিক্ষার সঙ্গে সুরুচির সম্পর্ক বিদ্যমান। আর সুরুচির সঙ্গে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলোর বিকাশের সম্ভাবনা জড়িত।

কাজী মোতাহার হোসেন পর্দা প্রথার বিরোধিতা করে ও নারী শিক্ষার পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সামাজিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে

মোতাহার হোসেন স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা।

২০. আবদুল হক (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

২১. *প্রাগুক্ত*।

তা বিবেচনা করা চলে। ইতঃপূর্বে তিনি নারীদের শুধু রান্না ও স্বামীর পা-টেপা কর্মের বিরোধিতা করেছেন। 'বাঙালীর সামাজিক জীবন' প্রবন্ধে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে, নারী শিক্ষার আবশ্যকতা ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে, তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। হিন্দু নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি ও পুরুষের পাশাপাশি তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন :

> এ বিষয়ে বাঙালী মুসলিম-মহিলারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষার চাঞ্চল্যে পর্দার কুহক কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে তাহাদের সত্বর মুক্তি নাই। অবশ্য মুক্তি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলার কথা বলিতেছি না ; তাহাদের বিকাশ ও পরিণতির কথাই বলিতেছি।[২২]

বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক দিক নিয়ে চিন্তাকালে অনিবার্যভাবে তিনি ভেবেছেন তাদের চর্চিত ধর্মাচার সম্পর্কে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর বা তাঁদের সংগ্রাম নয়, এমন ঘোষণা ইতঃপূর্বে দেবার পরও ধর্ম – বিশেষ করে, ইসলাম সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে প্রথাবিরোধী একটি মনোভাব সতত লক্ষণীয়। ধর্মবিশ্বাসের সব কিছুই তিনি অপরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করেন নি। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা তাঁর মধ্যে যে-বোধের জন্ম দিয়েছিলো তাতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন :

> বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে বরং সেইটিই প্রয়োজন। এই রূপ পরিবর্তনে প্রকৃত ধর্মের গায়ে আঁচড় লাগে না। কাঁচের গেলাস ভঙ্গিয়া গেলে, রূপার গেলাসে কাজ চালাইতে দোষ কি?[২৩]

লক্ষণীয় বিষয়, এখানে তিনি ধর্মবিশ্বাসকে ভঙ্গুর কাঁচের গ্লাস আর বিজ্ঞান-চিন্তাকে মূল্যবান রুপোর গ্লাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ-সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাকে ধর্ম বিরোধিতা আখ্যাত করা চলে না। কারণ মানুষের মনের মৌলিক বৃত্তিকেই তিনি 'ধর্ম' মনে করতেন। আর এই অধরা শাশ্বত বোধকে ভাবতেন মানুষের ব্যক্তিগত

---

২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

ব্যাপার।[২৪] তিনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অস্বীকার না করে এদের পারস্পরিক 'ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে'র কথা বলেছেন। সামাজিক ক্রিয়াকর্মহীন ধর্মবোধ বা সাম্প্রদায়িক গণ্ডি-অনুত্তীর্ণ ধর্মাচার মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, মানুষকে করে তোলে অবিবেচক, সহিংস ও অত্যাচারী। একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ঃ

> ধর্ম যখন ভাবের থেকে বিচ্যুত কতকগুলো ফরমুলায় পরিণত হয় তখন সে এক মারাত্মক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, যে শক্তিতে হিংসা-দ্বেষ, অত্যাচার, অবিচার, মারামারি, কাটাকাটির সূত্রপাত হয়।[২৫]

এই বক্তব্যটি ধর্মের ধ্বজাধারী তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধেও যে কত বড় প্রতিবাদ তা অনুধাবন করা কঠিন নয়। কাজী মোতাহার হোসেন কোনভাবেই মেনে নেন নি যে, রাজনীতির হাতিয়ার হবে ধর্ম। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার সম্পর্কে তাই তিনি 'বাংলা ভাষার নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধে বলেন :

> সচরাচর আমাদের ধর্ম্ম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে—অজ্ঞদিগের ধর্ম্মোন্মত্ততা সৃষ্টি করে তার সুযোগ মতলব হাসিল করে নেবার জন্য—ভোট সংগ্রহ বা পার্টি গঠন দ্বারা প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করবার উদ্দেশ্যে। আজকাল তাই দেখা যায়, ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতির একটি প্রধান অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম যে এর থেকে স্বতন্ত্র বস্তু একথা যেন আজকাল আমরা বুঝেও বুঝতে চাচ্ছি নে।[২৬]

ব্যক্তিগত জীবনে কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন ধর্মের প্রতি প্রবলভাবে আস্থাপ্রবণ একজন আস্তিক মানুষ। ঈশ্বরে শুধু আস্থা প্রকাশই নয়, প্রাত্যহিক ধর্মচর্চাও তিনি করতেন। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায়, শেষজীবনে ধর্মের প্রতি তিনি ক্রমশ অতি আস্থাবান হয়ে ওঠেন ; তবে কখনোই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন হন নি। ধর্মীয় কোন মোহও তাঁকে বিশেষভাবে পেয়ে বসে নি। তাই 'হযরত মুহম্মদ' লিখে তারপর 'সাল্লাললাহু আলাইহেস সালাম' লিখার অত্যাবশ্যকতা বোধ করতে তাঁকে দেখা যায় না। হযরত মুহম্মদকে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষের চেয়ে মানুষ

---

২৪. কাজী মোতাহার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

২৫. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০

২৬. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, ১৯৯২, পৃ. ৩০

হিসেবে ভাবাই উচিত বলে মনে করতেন। 'মানুষ মুহম্মদ' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধও রয়েছে। আসলে "সে সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অচলায়তন ভেঙ্গে আধুনিক জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার আকুলতা তাঁর ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক অনেক রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। এসব রচনায় তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধতার পরিবর্তে জীবন-ঘনিষ্ঠতা ও ইহলৌকিকতা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।"[২৭] এর চেয়েও বড় কথা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদ সীমানা অতিক্রমকারী অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ তাঁর বহু রচনা-কর্মে লক্ষ করা গেছে। তিনি মনে করতেন যে, জন্মের উপর যেহেতু মানুষের হাত নেই, তাই আজ কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ খ্রিস্টান ঘরের সন্তান। আসলে ঈশ্বরের কাছে 'আমরা সামাজিক মানুষ হিসেবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিছুই নই—সকলে মনুষ্য মাত্র।'[২৮] নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদীদেরও তিনি ঘৃণা করেন নি কখনও। বরং নাস্তিকদের মধ্যে অখণ্ড মানবতা আবিষ্কার করে আস্তিকের মানবতার পূর্ণতার সঙ্গে এর ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন। 'নাস্তিকের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> আস্তিক যেমন আত্মাকে অবিনাশী মনে করে, প্রকৃতিবাদীও তেমনি এক অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আস্তিক ও প্রকৃতিবাদী উভয়ের মধ্যে কর্ম প্রেরণায় বা ধর্মভাবে কোন সত্যিকার পার্থক্য নাই।[২৯]

এতো গেলো, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কাজী মোতাহার হোসেনের তাত্ত্বিক চিন্তা। এ-বিষয়ে তাঁর বাস্তব অনুভূতি ও ভাবনা কি? ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশে'র এক অধিবেশনে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে যখন তিনি বলেন :

> আশা করি নতুন জীবনের টানে আবার আমাদের দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য ফিরে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শতকরা ত্রিশজন অমুলসমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব

২৭. আবদুল্লাহ আল-মূতী, *কাজী মোতাহার হোসেন,* ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৪৮

২৮. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১৯

২৯. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪

> না। এই দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলার সমস্যা ভিন্ন ধরনের এবং দায়িত্বও অনেক বেশি।[৩০]

তখনই বুঝা যায়, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত একটি দেশের ধর্মীয় লেবাসধারী সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশেও তিনি কতটা দৃঢ়চিত্ত! এহলো তাঁর বিজ্ঞান-মনস্কতা আর যুক্তিবাদী চিন্তা থেকে উদ্ভূত স্বাজাত্যবোধ—মানবতাবোধের অখণ্ড ভাবনা। আসলে 'কি ধর্ম, কি আর্ট বা সাহিত্যসংস্কৃতি, কি সমাজ বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধকারের মূল লক্ষ্য ছিল সকল মানুষ এবং মানুষের যথার্থ কল্যাণ।'[৩১]

গ.

নিজের বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন যে, বিজ্ঞানের চেয়ে বাংলা সাহিত্যের দিকেই তাঁর পাল্লাটা কিঞ্চিৎ হেলে যাবে।[৩২] প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন সে পরিচয় আছে তাঁর নানা প্রবন্ধে। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল-প্রবাহ' গ্রন্থের আলোচনাকালে তিনি লিখেছেন যে, ভাবের দিকে লক্ষ রেখে সাহিত্যের বিচার করা কর্তব্য, কোন মতবাদের দাস হয়ে সাহিত্য-সেবায় বিঘ্ন অনিবার্য।[৩৩] 'শিল্পের জন্যে শিল্প'—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিলো শিল্প হবে মানুষের জন্যে, জীবনের জন্য, সমাজের কুসংস্কার দূর করার জন্যে। কাউকে খুশি করা বা চাটুকারিতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হবে না শিল্পের কোন মাধ্যম।—এই সাহিত্য ও শিল্পচিন্তার ব্যত্যয় তিনি লক্ষ করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যে। তিনি দেখেছেন, ওই সময় ধর্মীয় ফতোয়া অনুসরণ করে বা শাসকদের মেজাজ মতো সাহিত্য রচনার দিকেই ছিলো অধিকাংশের লক্ষ্য। এই ফতোয়াদানকারীদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং যারা কারণে-অকারণে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে রচনা শেষ করেন তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে

---

৩০. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯

৩১. সন্‌জীদা খাতুন, *প্রাগুক্ত*।

৩২. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫

৩৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮১

সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি স্পষ্ট ভাষায় :

> গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ চিত্র প্রভৃতির মারফত আমাদের সাহিত্যিকরা দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ে দেবেন। মোটকথা, জীবনের সব দিকেই সাহিত্যিকদের সত্য-দৃষ্টির সন্ধানী আলোক ফেলতে হবে।[৩৪]

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামি তমুদ্দুন সৃষ্টির নামে এক ধর্মীয় উম্মাদনায় মত্ত হন অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাবনাময় লেখক। কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তা ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ-বিষয়ে তাঁর যে ভাবনা, তখনকার বিচারে তা যথেষ্ট বিপ্লবী বলে মনে হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত '*বাংলা ভাষার নতুন বিন্যাস*' প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> বাংলা ভাষায় মুসলিম কৃষ্টির যেটুকু অভাব ছিল বা আছে, সেটুকু পূরণ করতে হবে—হিন্দু কৃষ্টি বর্জন করে নয়, তামাদ্দুনের সৃষ্টি করে উভয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টিতেই স্বার্থকর পরপুষ্ট ভাষার সৃষ্টি হবে।[৩৫]

এই অসাম্প্রদায়িক জাতিগত চেতনাই ছিলো তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার মূলে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সাহিত্যকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যাঁরা ধর্মকে ফর্মুলায় ফেলে শক্ত করে রাখার পক্ষপাতী, তাঁরাই সাহিত্যের বিকাশশীলতার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ সৃষ্টি করে থাকেন।[৩৬] মাসিক '*দিলরুবা*' পত্রিকার (১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা) অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'নতুন অবস্থায় সাহিত্য' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পকলা ও সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তথাকথিত 'ইসলামি সাহিত্য' বা 'হিন্দু সাহিত্য' ইত্যাদি ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্য কখনো সম্প্রদায়গত হতে পারে না। যদি কেউ সে চেষ্টা করে থাকেন তবে তা ঠিক সাহিত্য না হয়ে সম্প্রদায় বিশেষের বক্তব্য হয়ে উঠবে। উপহাস করে তিনি এগুলোকে তুলনা করেছেন সাহিত্য-বটিকা বা সালসার সঙ্গে :

> পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশেই বাস করবে, আর সে মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্রই হচ্ছে সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি। ইসলামী সাহিত্য হিন্দু

---

৩৪. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১

৩৫. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ৩র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৩

৩৬. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪

> সাহিত্য—এসব কথার মধ্যে একটু ত্রুটি রয়েছে। কতকগুলি ব্যাপার আছে, যা নিছক হিন্দুর ঘরের কথা বা মুসলমানের ঘরের কথা—সেগুলির মধ্যে যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকের কোন গরজ বা ঔৎসুক্য বা ভাব-সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে সেগুলি ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না—তা শুধু সম্প্রদায় বিশেষের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্যিক পিল্ বা সালসা মাত্র।[৩৭]

তবে সাহিত্যে সম্প্রদায়ের জীবন-চর্যাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে এ-কথা স্পষ্টতর যে, বিশেষ সম্প্রদায়কে নির্ভর করে সাহিত্য রচিত হতে পারে, কিন্তু এর আবেদন হবে সর্বজনীন। তিনি আরও মনে করতেন, সমাজ-মনের প্রকাশ থাকলেই সাহিত্য যেহেতু হৃদয়গ্রাহী হয়, সেহেতু সাহিত্যে এর প্রতিফলন অনিবার্য। ইতঃপূর্বে রচিত সাহিত্যে সমাজ-মন রূপায়িত হয়েছে সত্য কিন্তু তা কলিকাতা শহর বা তার উপকণ্ঠের। অথচ "এর বাইরে যে বিপুল পল্লীসমাজ—ঋণগ্রস্ত কৃষক, দিনমজুর, কুমোর, ধীরব, কামার, স্কুল মাষ্টার, হাতুড়ে ডাক্তার, ছোটখাট জোতদার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এরা নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, তার পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না।"[৩৮] — এ-কারণে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্র হবার পর অত্যন্ত আশাবাদী মন নিয়ে তিনি 'নতুন করে বুনিয়াদ' গড়ে তোলার কথা বলেন। এ-জন্যে কলিকাতা বা ঢাকার দিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে সাঙ্গীকৃত করে সাহিত্যরচনায় অগ্রবর্তী হবার পক্ষে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত :

> এতে আমরা প্রাদেশিকতার নামে চমৎকার ভাব-প্রকাশী শব্দ বা বাক্রীতি বাদ দিব না ; ইসলামী ও হিন্দু কালচারের যে-সব ভাব ও ভাষা প্রচলিত আছে সাদরে সে সবকে স্থান দেব। দেশবাসীর জীবন সমস্যার সব বিষয় নিয়ে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য গড়ে তুলব. এই ভাবেই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য হবে ব্যাপক, বিরাট, সর্বজনগ্রাহ্য। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ভূমি হবে পাকিস্তানী সাহিত্য।[৩৯]

---

৩৭. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* ৪র্থ খণ্ড. পৃ. ২৫৭

৩৮. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৯

৩৯. *প্রাগুক্ত।*

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর 'আমাদের সাহিত্য' বা 'পাকিস্তানী সাহিত্য' ইত্যাদি অভিধায় নতুন রাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্যের রূপ ও চরিত্র নির্ধারণ-বিষয়ে যে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছিলো সে-পরিপ্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে কাজী মোতাহার হোসেনের অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। অসাম্প্রদায়িকতা ও জীবনরসে উজ্জীবিত হবার শর্ত ছিলো তাঁর এ সাহিত্য-চিন্তার মৌল বিবেচনা। এ-বিষয়টি 'নতুন অবস্থায় সাহিত্য' শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যাঁরা ইসলামি সাহিত্য বলতে কেবল তৌহিদবাদ এবং হিন্দু সাহিত্য বলতে ভজন-কীর্তন বুঝেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সীমানাকে ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেন। তাঁর মতে : "সাহিত্য তখনই সার্থক হয় যখন তা সম্প্রদায় পেরিয়ে মানবতার মধ্যে প্রসারিত হয়। সম্প্রদায়গত পরিবেশের মধ্যে তার মূল থাকতে পারে, কিন্তু তার আবেদন হবে সার্ব্বজনীন।"[৪০] একই প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের রূপগত ও রসগত দিক সম্পর্কেও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্যের রূপ ও রসগত দিক সম্পর্কে যেভাবে লেখকদের সচেতন করেছেন তা অনেকাংশেই বাংলা গদ্য রচনার প্রারম্ভকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ বা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' অথবা 'সহজ রচনা শিক্ষা' শীর্ষক রচনার সমতুল্য। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পুথি সাহিত্যের মতো ইসলামি ভাব দেখাতে গিয়ে শুধু আয়েন-গায়েনের ছড়াছড়িতেই ইসলামি তামাদ্দুন প্রকাশিত হয় না। কারণ সময়ের চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "তাই ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে কাজ হবে না—ঐ কাজই সময় উপযোগী ভাব ও ভাষা দিয়ে নতুন করে আনজাম দিতে হবে।"[৪১] আবদুল ওহাব রচিত 'কাছাছোল আম্বিয়া'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেছেন : "এর চেয়ে ঢের বেশী সবল ও সরস ছন্দ না হলে এখনকার পাঠকের মনে ধরবে না। সহ্যমত প্রচলিত মুসলমানী শব্দ নিশ্চয়ই লাগাতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু মাত্রাবোধও থাকা চাই।"[৪২] উল্লেখ্য কাজী মোতাহার কথিত এই 'মাত্রাবোধ'ই হলো সাহিত্যিক গুণাবলী ও পরিমিতিবোধ—যার

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭

৪১. *প্রাগুক্ত*।

৪২. *প্রাগুক্ত*।

অভাবে রচয়িতার পুরো আয়োজনই অকার্যকর হয়ে ওঠে। পাঠকের রুচি-উন্নয়ন ও প্রকৃত সাহিত্যরস সৃষ্টি এবং তার পরিবেশনের ব্যাপারে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেছেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের বক্তব্য :

> বদ রস বা অশ্লীলতা যে 'রস' এ-বোধ সাহিত্যিকদের তো আবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু শুধু তাতেই চলবে না—ক্রমান্বয়ে জনগণের মধ্যেও যাতে রসবোধ সম্পর্কে শুচিতা সার্ব্বজনীনভাবে জাগ্রত হয় তার চেষ্টাও করতে হবে।[৪৩]

সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর এ বক্তব্য একটি সপরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাত। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন : "সাহিত্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা মেথ্যু আর্নল্ড, লিও টলস্টয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী এবং কলাকৈবল্যবাদ বিরোধী।"[৪৪]

কাজী মোতাহার হোসেনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তায় হীন রাজনীতির চোরাবালিতে স্বার্থ সিদ্ধির প্রবণতা ও ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বিন্দুমাত্র স্থান ছিলো না। আর তাই পাকিস্তানে যখন চলছে রবীন্দ্র-বর্জন আর রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে আরোপ হচ্ছে শত বাধা—তখনও বলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে (১৯৬১) লিখিত 'সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে চৌথা আসমান থেকে আসা ঈসা নবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।[৪৫] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'চিত্ত-নামা'য় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে নবীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তবে ব্যাপক সমালোচনার মুখে তাঁকে সে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়। কাজী মোতাহার হোসেনের ক্ষেত্রে এ-রকম কিছু হয়েছে বলে জানা যায় না। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অবদান ও স্থান সম্পর্কে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে কাজী মোতাহার হোসেনের রবীন্দ্র ভাবনা।

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*।

৪৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, কাজী মোতাহার হোসেনের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রসঙ্গে, *বইয়ের খবর*; প্রাগুক্ত।

৪৫. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪

ঘ.

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তায় দু'ধরনের মাত্রা লক্ষ করা যায়—এক, ভাষা-গঠন দুই. ভাষা-রক্ষা। বাংলা ভাষার গঠন-প্রকৃতি ও এর সংস্কার-বিষয়ক সুপারিশ ও মতামত জানিয়ে তিনি 'বাংলা ভাষা সংস্কার', 'বাংলা বানান সংস্কার' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এর চেয়েও ভাষা-রক্ষা বিষয়ক তাঁর চিন্তা-ভাবনা অধিক মূল্যবান। ১৯৪৭ – পরবর্তীকাল থেকে পুরো পাকিস্তানি সময়টাই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে যে লড়াই-সংগ্রাম বাঙালিরা করেছে—সে বিষয়ে কাজী মোতাহার হোসেনের বক্তব্যও বিশেষ মূল্য দাবি করে। এ-সময় অনেক বাঙালি উর্দু ভাষার মোহে পড়ে বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করেছেন। তিনি এই মোহ থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দু মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহর মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথচ বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত। তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই, ব্যাপারটা শুধুই ধ্বনিজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৬]

কাজী মোতাহার হোসেন কথিত 'বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোকে'র এই উর্দু মোহের পাশাপাশি শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেবার পাঁয়তারা করে। পরিণতিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রক্ত দিতে হয় ছাত্র-জনতাকে। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেই তিনি বলেন :

> পূর্ব পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাঙলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন। কোনও কোনও পরমুখাপেক্ষী বাঙালীর মুখেই ইতিমধ্যে উর্দুর ঝনৎকার শুনা যাচ্ছে। কিন্তু এদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রশংসা করা যায় না।[৪৭]

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি একই প্রবন্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এই বলে যে, এতে বাঙালির জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে আর

---

৪৬. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩

৪৭. ঐ, পৃ. ২২৪

বাঙালি পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিরাজের কবলে গিয়ে পড়বে। শিক্ষার বাহন হিসেবেও তিনি মাতৃভাষাকে গ্রহণের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। 'শিক্ষা-প্রসঙ্গে'[৪৮] ওই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেন : "মাতৃভাষার দাবী সর্বাগ্রে ও তারপর দ্বিতীয় ভাষা রূপে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা উর্দু শিক্ষণীয়।" এ-প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট অভিমত : "সকল ছাত্রের উপরেই এভাষা [উর্দু] অতদিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা যুক্তিযুক্ত হবে না।" বিশ্ববিদ্যালয়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন মোতাহার হোসেন। তবে বিজ্ঞান বা বিদেশ বিষয়ক উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রয়োজন মতো অন্য ভাষা শেখার কথাও তিনি বলেছেন। কাজী মোতাহার হোসেনের এই শিক্ষা-ভাবনা শুধু ভাষা-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি নিরপক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কোন বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া নয়, বরং সংস্কৃতি বিনিময় ও সমন্বয়ই ছিলো কাজী মোতাহার হোসেনের লক্ষ্য :

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমানে শৈশব শিক্ষার পরিকল্পনায় যাহাতে জাতধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্র হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিতভাবে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।[৪৯]

শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনীতির সংযোগ বিষয়েও তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য আছে। কৃষি-নির্ভর বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসকে কৃষি-সংশ্লিষ্ট করা যে অত্যাবশ্যক একথা জোর দিয়ে বলেছেন তিনি। চীন দেশে উচ্চশিক্ষা শেষে গ্রামে কজ করা বাধ্যতামূলক। অথচ, আমাদের দেশে কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও কেউ গ্রামে যেতে চান না, চান শহরে অফিসার হতে। তিনি কৃষি সম্পর্কে আমাদের এই উন্নাসিকতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আর বলেছেন যে, মনে হয় এসব যেন এমন জিনিস যা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাবার যোগ্যও নয়। এরপরই অবশ্য তিনি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন এ বিষয়ে :

---

৪৮. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫
৪৯. *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫

> বর্তমানে অবশ্যই এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে, গতর খাটান পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে, আর দেশের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।[৫০]

কাজী মোতাহার হোসেন এই বিষয়গুলোকে শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছেন।

ঙ.

কাজী মোতাহার হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 'সঞ্চরণ' (১৯৩৭) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠি লিখে 'ভাষার প্রাঞ্জলতা', 'বলবার সাহস' আর 'চিন্তার স্বকীয়তা'র জন্যে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।[৫১] জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে এই তিনটি গুণ সযত্নে লালন করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে অবুল ফজল লিখেছেন :

> মুসলিম সাহিত্য-সমাজ উঠে গিয়েছে দীর্ঘকাল, 'শিখা'ও বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের আদর্শ ও মনোভাব একা কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবই বহন করে চলেছেন এ যাবৎ।[৫২]

প্রকৃত অর্থেই, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লড়ে গেছেন—শারীরিকভাবে না পারলেও চিন্তাশক্তি দিয়ে—অবৈজ্ঞানিকতা, পশ্চাৎপদতা আর সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে।

কাজী মোতাহার হোসেনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার *মোতাহার হোসেন স্মরণ সংখ্যায়* সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর সমাজ ও সংগঠন-সংশ্লিষ্টতা এবং কর্মব্যাপ্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> সেই কবে একেবারে প্রথম জীবনে, তরুণ সংগঠক ছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের। ১৯২৬ সালের কথা সেটি। পরে ঐ ধারা থেকে সরে দাঁড়ানো তো

---

৫০. আবদুল হক (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৫১. "আপনি বিচিত্র ভাবকে এবং আলোচনার বিষয়কে স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় রূপ দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি আপনার 'সঞ্চরণ' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তা' পড়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আপনার বলবার সাহস এবং চিন্তার স্বকীয়তা সাধুবাদ যোগ্য। সাহিত্য পথে আপনার অধ্যবসায় জয়যুক্ত হোক এই কামনা করি।"— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২ ভাদ্র ১৩৪৪ – উদ্ধৃত, খোন্দকার সিরাজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২-২৩

৫২ আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

> দূরের কথা, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান-পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়েছে, প্রতিবাদ হয়েছে যত ক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতিতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করবে কে?[৫৩]

তাঁর আজন্ম কর্মসংশ্লিষ্টতা আর চিন্তার শাণিত ধারা জাগ্রত ছিলো কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে। তবু বর্তমান শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে একথা বলা চলে, যে 'শিখা' নিয়ে কাজী মোতাহার হোসেনকে একদিন ধর্ম বিরোধিতার অপবাদ শুনতে হয়েছিলো, সত্তর বছর পর আজও 'শিখা'-বিতর্ক ('শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' নিয়ে) বর্তমান, ধর্ম রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার, বিজ্ঞান-ভিত্তিক সেক্যুলার শিক্ষা-ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় সুকুমার বৃত্তির চেয়ে প্রচারণার আধিক্য, যুক্তিবাদের চাইতে অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি মোহই যেন বেশি। এমতাবস্থায়, জন্মশতবর্ষে কাজী মোতাহার হোসেনকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁর চেতনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাই আজ মুখ্য হয়ে ওঠে।

---

৫৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী সাহেবের নিজের জগৎ, *বইয়ের খবর*, *প্রাগুক্ত*।